২০০৭ সালের নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে

শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

২০০৭ সালের নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে

শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

আল আযামী পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৬

২০০৭ সালের নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১১৯/২ কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ ❖ স্বত্ব : লেখক।

নির্ধারিত মূল্য : আট টাকা মাত্র

www.pathagar.com

এ বই কেন?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ হাসিনা এক বিরল জঘন্য হিংস্র ব্যক্তিত্ব। তিনি ছাড়া অন্য কেউ রাজনীতিকে এতটা কলুষিত করেননি; আর কেউ গণতন্ত্রের মুখোশ পরে এমন চরম ফ্যাসিবাদী চরিত্রের পরিচয় দেননি; গণ-আন্দোলনের নামে আর কেউ জনগণকে এত যাতনা দিতে পারেননি; ক্ষমতায় গিয়ে আর কেউ এতটা স্বেচ্ছাচারী হননি; ক্ষমতা হারিয়ে আর কেউ এতটা অশালীন ও ইতর ভাষা ব্যবহার করেননি; প্রতিপক্ষের প্রতিটি কাজে এমন দক্ষতার সাথে কেউ বদনিয়ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি; রাজনৈতিক বক্তব্যে আর কেউ এত জঘন্যভাবে মিথ্যার বেসাতি করেননি।

এ কারণেই তার সম্পর্কে ইতঃপূর্বে দুটো পুস্তিকা রচনা করা কর্তব্য মনে করেছি। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তার শাসনামল সম্পর্কে লেখা বইটির নাম 'শেখ হাসিনার দুঃশাসনের ৫ বছর'। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর তার বাংলাদেশ ও গণতন্ত্রবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে লেখা বইটির নাম 'শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি'।

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালের জুলাই থেকে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের নামে যে ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব চালাচ্ছেন, সে বিষয়ে এ বইটি লিখলাম।

জনগণ যাতে শেখ হাসিনার অপরাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে জয়যুক্ত করতে সক্ষম হয়, সে উদ্দেশ্যেই এ তিনটি বই রচনা করা কর্তব্য মনে করলাম। আল্লাহ তাআলা আমার এ আশা পূরণ করুন।

গালাম আযম
ডিসেম্বর ২০০৬

www.pathagar.com

সূচিপত্র

শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি ৫
শেখ হাসিনার গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন ৫
শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলন ৫
সংস্কার আন্দোলনের প্রধান দাবি ৬
২৮ অক্টোবর, শেখ হাসিনার সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব ৭
সুপ্রিম কোর্টে আওয়ামী আইনজীবীদের তাণ্ডব ৯
এ হামলা নতুন নয় ১০
বিবেকহীন আওয়ামী নেতৃত্ব ১০
শেখ হাসিনার একটি সর্বনাশা কীর্তি ১১
অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফর্মুলাই কেয়ারটেকার সরকার ১১
নির্বাচন কমিশনারদের উপর এত ক্ষিপ্ত কেন? ১৩
নির্বাচনে কারচুপি কীভাবে হয়? ১৩
২০০৪ সালের ৪ জানুয়ারি বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের প্রদত্ত বিবৃতি ১৪
বিজয়ের নিশ্চয়তা কে দেবে শেখ হাসিনাকে? ১৬
শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি ১৬
স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ ১৮
কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টাদের ভূমিকা ১৮
বিচারপতি কেএম হাসানকে বিব্রত করে শেখ হাসিনা কি বিজয়ী হলেন? ১৯
শেখ হাসিনার ক্ষমতালিপ্সাই রাজনৈতিক সংকটের আসল কারণ ২০
গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আসল কারণ ২১
সংবিধান সংশোধন ও লঙ্ঘন এক কথা নয় ২২
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটিই এখন বিপন্ন ২২
শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল ২৩
বাংলাদেশের মালিক কে? জনগণ না কি শেখ হাসিনা? ২৫
কেয়ারটেকার সরকার আমলে শেখ হাসিনার মালিকসুলভ হুমকি ২৬
দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শেখ হাসিনার অবদান ২৭
শেখ হাসিনা যে যে যোগ্যতার অধিকারিণী ৩০
চারদলীয় জোটকেই ক্ষমতায় বসাতে হবে ৩২

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি

শেখ হাসিনার রাজনীতি যে কতটা হিংস্র, সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণাদি ও তথ্যাবলি এ পুস্তিকায় পরিবেশন করা হয়েছে। বিশেষ করে চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরের দিন থেকে লাঠি-বৈঠা-লগি নিয়ে সন্ত্রাস করার জন্য তার বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে হিংস্রতার যে রেকর্ড স্থাপন করলেন, তা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

শেখ হাসিনার গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন

২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিলের গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরও ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর জোট সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত 'খালেদা-নিজামী' সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বার বার গণ-অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

২০০১ সালে যে জনগণ চার দলীয় জোটকে সংসদ নির্বাচনে দু-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে বিজয়ী করল, তারা নিজেদের নির্বাচিত সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া কেন দেবে? তাই স্বাভাবিক কারণেই তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন প্রত্যেক বারই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলন

ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের কারণে জনগণের নিকট ইসলামবিরোধী ও ভারতের দালাল হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগ ২০০৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারবে না বলে আশঙ্কা করেই চার দলীয় জোটের আদলে সরকারি জোটের বাইরের দলগুলোকে নিয়ে একটি মহাজোট গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। উল্লেখযোগ্য কোনো দলই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হতে সম্মত হয়নি; এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিও রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৩টি রাজনৈতিক এতিম দল নিয়ে তিনি ১৪ দলীয় জোটের নেতৃত্ব লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন।

নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা না দেখে শেখ হাসিনা নির্বাচন বানচাল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না

www.pathagar.com

পারে। দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বিদেশের সহযোগিতায় গণ-অভ্যুত্থানের নামে ক্ষমতা দখলের বদনিয়তে তারা তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।

২০০৫ সালের ১৫ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে শেখ হাসিনা সংস্কার-প্রস্তাবের নামে ৩১ দফা দাবিনামা পেশ করে সরকারকে হুমকি দেন যে, এসব দাবি না মানলে দেশে নির্বাচন হতেই দেবেন না। এ দেশটাকে তিনি তার পিতার তালুক মনে করেন কি না জানি না। তিনি যে দাপটের ভাষায় কথা বলেন, তাতে মনে হয় তিনিই দেশের কর্তৃত্বের অধিকারী।

সংস্কার আন্দোলনের প্রধান দাবি

আগামী নবম সংসদ নির্বাচন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করবেন এর প্রধান উপদেষ্টা সংবিধান অনুযায়ী যাঁর হওয়ার কথা, তিনি ২৫ বছর হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সর্বশেষে প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এর পূর্বে এডভোকেট থাকাকালে তিনি বিএনপি'র দলীয় কোনো পদে থাকায় তাকে শেখ হাসিনা কিছুতেই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মেনে নিতে পারেন না– এটাই তার প্রধানতম সংস্কার দাবি।

বিচারপতিগণও নির্বাচনে ভোট দেন। নিশ্চয়ই সব বিচারক একই দলের প্রার্থীকে ভোট দেন না; কিন্তু তাঁরা যে দলকেই ভোট দেন, দীর্ঘ দিন বিচারপতি হিসেবে নিরপেক্ষভাবে রায় দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে এমন 'জুডিশিয়াল মাইন্ড' গড়ে ওঠে, যার ফলে তাঁরা যেকোনো দায়িত্ব পালনের বেলায় ন্যায়-নীতি মেনে চলায় অভ্যস্ত হন। তাই যখন কোনো তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়, তখনই বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিই করা হয়। বিশ্বের সর্বত্রই বিচারকদের এ মর্যাদা স্বীকৃত।

শেখ হাসিনা বিচারপতি কেএম হাসানকে ঐ পদে নিয়োগ দেওয়ার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসী তৎপরতা চালান। ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিন ২৮ তারিখে বিচারপতি কেএম হাসানের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা।

শেখ হাসিনা দুমাস আগেই সংবিধানের এ স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিরোধ করার জন্য তার দলীয় ক্যাডারদেরকে নির্দেশ দেন যে, যদি কেএম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয় তবে সারা দেশ থেকে যেন তারা লাঠি-বৈঠা ও লগি নিয়ে ঢাকায় হাজির হয়।

www.pathagar.com

এ জাতীয় নির্দেশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক নেতার মুখ থেকে আসা স্বাভাবিক নয়। তার পিতা শেখ মুজিব পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, যার হাতে যা আছে তা নিয়ে যেন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে; কিন্তু শেখ হাসিনা দেশের জনগণ ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ভূমিকা পালনের ডাক দিলেন।

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কেএম হাসানের মতো একজন ভদ্রলোক এর মোকাবিলা কী দিয়ে করবেন? ২৮ অক্টোবর তাঁর শপথ নেওয়ার কথা ছিল।

২৮ অক্টোবর, শেখ হাসিনার সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব

২৭ অক্টোবর চার দলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের শেষ দিন। পরের দিন সন্ধ্যা ৮টায় বঙ্গভবনে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে বিচারপতি কেএম হাসানের শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার কথা। সিডিউল অনুযায়ী বঙ্গভবনে এর প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো।

সেদিন বিএনপি জনসভা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পল্টন ময়দান ব্যবহারের অনুমতি নিয়েছিল; কিন্তু আওয়ামী লীগ ঐতিহ্য অনুযায়ী লাঠি-বৈঠা-লগি নিয়ে আগের রাতেই পল্টন ময়দান দখল করে মঞ্চ তৈরি করে নেয়। পুলিশ প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখার স্বার্থে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী পল্টন ময়দানে ১৪৪ ধারা জারি করে। বিএনপি পল্টন ময়দানের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের সাথে লড়াই না করে নয়াপল্টনের রাজপথে জনসভা করে।

শেখ হাসিনা পুলিশের বেআদবি (!) সহ্য করতে রাজি না হয়ে তার লাঠি-বৈঠা-লগি বাহিনীকে পল্টন ময়দানে জনসভা করার উদ্দেশ্যে সারা দিন পুলিশবাহিনীর সাথে লড়াই করার নির্দেশ দেন। তিনি জাঁদরেল জেনারেলের মতো পুলিশের সাথে লড়াই করার যোগ্য একদল মহিলা ক্যাডারও গড়ে তোলেন, যাদেরকে প্রতিটি মিছিলে তৎপর দেখা যায়। ঐ দিন অবশ্য পল্টন দখলের জন্য তাদেরকে ময়দানে দেখা যায়নি।

পুলিশবাহিনী পল্টন ময়দান দখল করে রাখায় আওয়ামী লীগ মুক্তাঙ্গনে জনসভা করতে বাধ্য হয়। পুলিশবাহিনীর গোটা শক্তি পল্টনেই ব্যস্ত। বিএনপি'র জনসভায়ও প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাব পাহারায় ছিল।

www.pathagar.com

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর জনসভা উপলক্ষে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ সমাবেশস্থলে কর্তব্যরত ছিলেন।

মুক্তাঙ্গনে ১৪ দলের সমাবেশ, আর বাইতুল মুকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতের জনসভা। দুটোর দূরত্ব বেশি না হলেও পৃথক পৃথক স্থানে দুটো সমাবেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধা স্বাভাবিক নয়।

শেখ হাসিনার সন্ত্রাসীরা পল্টনে সমাবেশ করতে পারছে না, আর জামায়াতে ইসলামী সমাবেশ করছে– এটা তাদের কেমন করে সহ্য হয়? তাছাড়া তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দুশমন হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর অস্তিত্ব তাদের ঐ মতবাদের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় বলে তাদের ধারণা।

জামায়াতের জনসভা বিকাল তিনটায় শুরু হওয়ার কথা; কিন্তু সমাবেশস্থলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যারা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা লাঠি-বৈঠা-লগি ও পিস্তল নিয়ে দুপুর সাড়ে এগারোটায়ই হামলা শুরু করল। স্বেচ্ছাসেবকরা জীবনবাজি রেখে প্রতিরোধ করতে থাকল, যাতে সমাবেশ সফল করা যায়।

মঞ্চ থেকে তখন হামদ-না'ত ও অন্যান্য ইসলামী গান গেয়ে উপস্থিত কয়েক হাজার শ্রোতাকে তৃপ্তি দান করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসীরা একদল প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর আরেক দল এসে আক্রমণ চালায়; এমনকি জনসভা চলার সময়ও হিংস্র বাহিনীর হামলা অব্যাহত থাকে। বিকাল পাঁচটায় যখন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বক্তৃতা শুরু করেন, তখন নিকটবর্তী উঁচু দালানের ছাদ থেকে হায়েনার দল বোমা ছুড়তে থাকে এবং গুলিবর্ষণ করতে থাকে।

চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ আগের দিন শেষ হয়ে গেলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল পুলিশবাহিনীর কর্তব্য ছিল হামলাকারীদের দমন করা। সাড়ে এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সামান্য সামান্য বিরতি দিয়ে হামলা অব্যাহত থাকে। পুলিশ তামাশা দেখাই যথেষ্ট মনে করে।

ঐ দিনের নৃশংস হামলায় ইসলামী আন্দোলনের ৬ জন মুজাহিদ শহীদ হন এবং প্রায় ৬০০ আহত হন। এখনো দুজন হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ারে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন এবং আজ (৪ নভেম্বর) পর্যন্ত ৪০ জনেরও বেশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

www.pathagar.com

টিভিতে প্রদর্শিত হায়েনাদের লাঠি ও বৈঠার আঘাতের করুণ দৃশ্য দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সবাইকে বিমর্ষ ও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে মানুষ পশুর চেয়েও এতটা হিংস্র হতে পারে– আওয়ামী দুষ্কৃতকারী গুণ্ডারা এর জঘন্য প্রমাণ দিয়েছে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ নৃশংসতার নিন্দা জানিয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের বিদেশি কূটনীতিকগণ শুধু দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিএনপি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নিন্দা জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। শেখ হাসিনারা তো নিশ্চয়ই উল্লসিত হয়েছেন এবং এটাকেও তাদের বিজয় মনে করছেন।

বিশ্বের অন্য কোনো দেশে শেখ হাসিনার মতো এমন রাক্ষসী ও হিংস্র নেত্রী আছে কি না আমার জানা নেই। তিনি লাঠি-বৈঠা-লগি নিয়ে ময়দানে কী উদ্দেশ্যে তার বাহিনীকে নিয়োগ করলেন? এ জাতীয় পশুত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনিই এককভাবে দায়ী। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতার এক নম্বর আসামি তিনি। দুনিয়ায় এর বিচার না হলেও আল্লাহ অবশ্যই এর বিচার করবেন।

সুপ্রিম কোর্টে আওয়ামী আইনজীবীদের তাণ্ডব

২০০৬ সালের ৩০ নভেম্বর হাইকোর্টের এজলাসে আওয়ামী আইনজীবীদের মর্জির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এক নির্দেশ দেন। তারা আইনজীবীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। তারা উচ্চশিক্ষিত, ব্যারিস্টার ও সিনিয়র আইনজীবী। প্রধান বিচারপতির নির্দেশের বিরুদ্ধে তারা আইনগত প্রতিকারের চেষ্টা না করে পেশীশক্তি প্রয়োগ করলেন। এটাই আওয়ামীদের সনাতন মেজাজ।

তারা প্রধান বিচারপতির এজলাস ও চেম্বারে এবং এটর্নি জেনারেলের চেম্বারে ভাঙচুর ও তছনছ করে গোটা কোর্ট বিল্ডিংয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। তাদের তাণ্ডবে উৎসাহিত হয়ে তাদের সন্ত্রাসী সমর্থকরা নিচে বিএনপিপন্থিদের গাড়ি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের মতো উচ্চমানের লোকদেরকে পুলিশ এসে নিয়ন্ত্রণ না করলে তারা হয়তো আরো অনেক কিছু করতে দ্বিধা করতেন না।

বিশ্বের ইতিহাসে এমন ঘৃণ্য ও জঘন্য ঘটনার নজির নেই। বিচারকগণের সাথে অশোভন আচরণ করলেও আদালত অবমাননার মামলায় শাস্তি পেতে হয়। সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান। সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার ইখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

জনগণের শেষ ভরসা সুপ্রিম কোর্ট। সরকারি সিদ্ধান্তও সুপ্রিম কোর্ট নাচক করতে পারে। সংসদে গৃহীত কোনো আইনও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার দোষে সুপ্রিম কোর্টে বাতিল ঘোষিত হতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের উচ্চমর্যাদা সংবিধানে স্বীকৃত। সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ সুপ্রিম কোর্টকে সমীহ করে। রাষ্ট্রের সকল সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সুপ্রিম কোর্টকে শ্রদ্ধা করে। আওয়ামী লীগ সুপ্রিম কোর্টে তাদের বর্বরতা ও হিংস্রতার নগ্ন প্রদর্শনী করে তাদের আসল পরিচয় জনগণের নিকট স্পষ্ট করে দিল।

এ হামলা নতুন নয়

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের এ ফ্যাসিবাদী বদভ্যাস আওয়ামী লীগের পুরনো ঐতিহ্য। ১৯৯৪ সালের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পর চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের জামায়াতের সমাবেশে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালালে জামায়াতের দুজন শহীদ হন এবং শতাধিক আহত হন। আর সন্ত্রাসীদের তিন জন মারা যায়।

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভায় আওয়ামী সশস্ত্র গুণ্ডারা হামলা চালায়। ময়দানের পশ্চিম গেট দিয়ে সভাস্থলে প্রবেশের চেষ্টা করলে দুঘণ্টা পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন। আমি সভাপতিত্ব করছিলাম। উপস্থিত পুলিশ বাহিনীকে আমি বারবার আহ্বান জানালাম যে, হামলাকারীদেরকে যেন হটিয়ে দেয়। বিলম্বে হলেও যখন পুলিশ গেটে অবস্থান নিল তখন আমি সরল বিশ্বাসে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে গেট থেকে সরে আসার নির্দেশ দেই। ডিসি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে সন্ত্রাসীদেরকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দিলে তারা যে তাণ্ডব চালাল, 'জীবনে যা দেখলাম' তৃতীয় খণ্ডের ৯৭ পৃষ্ঠায় এর বিবরণ রয়েছে। ডিসি যে কাদিয়ানী হিসেবেই জামায়াতের চরম দুশমনের ভূমিকা পালন করেছেন, সে কথা পরে জানা গেল। ঐ হামলায় জামায়াতের দুজন শহীদ হন।

বিবেকহীন আওয়ামী নেতৃত্ব

২৮ অক্টোবর ('০৬) জামায়াতের জনসভায় নৃশংস হামলার পাশবিক দৃশ্য টেলিভিশনে দেশে-বিদেশে অনেকেই দেখেছেন। শুধু রাজনৈতিক বিদ্বেষবশত আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এক-এক জন নিরপরাধ মানুষকে লাঠি-বৈঠা ও লগি দিয়ে অব্যাহতভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। তাদেরকে নিহতের লাশের উপর দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

যেভাবে উল্লাস করতে দেখা গেছে, পৃথিবীতে এর নজির পাওয়া কঠিন। মানুষকে এমন যোগ্য নরপিশাচ হিসেবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব শেখ হাসিনাকে দিতেই হয়। শেখ হাসিনা ও ১৪ দলীয় নেতারা নিশ্চয়ই টিভিতে এ দৃশ্য দেখেছেন। যদি তাদের বিবেক বলে কোনো সত্তা থাকত, তাহলে অবশ্যই তারা এর নিন্দা জানাতেন। নিজের সন্তানও যদি কোনো জঘন্য কাজ করে তাহলে পিতার বিবেক সন্তানকে শাস্তি দিতে বাধ্য করে।

শেখ হাসিনার একটি সর্বনাশা কীর্তি

বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন একটি সর্বনাশা কীর্তি সংযোজন করল। গণতন্ত্র হত্যা তো তার পিতারই আদর্শ। লগি-বৈঠা দিয়ে তো সে আদর্শের অনুসরণ করেই বিচারপতি কেএম হাসানকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করা হলো। তিনি না হয় ২৫ বছর আগে বিএনপি করার অপরাধে দোষী; কিন্তু বিচারপতি এমএ আজিজ তো কোনো দল করতেন বলে অভিযোগ নেই। তবুও একই কায়দায় দফায় দফায় অবরোধ ও লগি-বৈঠার হুমকি দিয়ে তাঁকে পদত্যাগ করাতে ব্যর্থ হয়ে ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টই সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকারী। সংবিধান রক্ষার শেষ ভরসাই সুপ্রিম কোর্ট। যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে এভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত করে লাঞ্ছিত করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে কোনো বিচারপতিই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হবেন না। ফলে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শেখ হাসিনা এ সর্বনাশটিই কি করতে চাচ্ছেন?

অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফর্মুলাই কেয়ারটেকার সরকার

শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি দখল করেন। জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র বহাল করলেও ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে তাঁর দলের দু-তৃতীয়াংশ আসন নিশ্চিত করেন। এর মানে পার্থক্য থাকলেও ঐ দুটো নির্বাচন মোটেই নিরপেক্ষ ছিল না।

নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তার ফর্মুলা হিসেবেই জামায়াতে ইসলামী 'কেয়ারটেকার সরকার' প্রস্তাব পেশ করে। স্বৈরশাসক এরশাদের সাথে ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াত ঐ সংলাপে উভয় জোটকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, যাতে ১৫+৭+জামায়াত মোট ২৩

www.pathagar.com

দল একসাথে সংলাপে কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা পেশ করে। উভয় জোট এ প্রস্তাবে সম্মত হলে ঐ বছরই স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতো। যা হোক, বিলম্বে হলেও ১৯৯০ সালে সকল দল এ বিষয়ে একমত হওয়ায় স্বৈরশাসন খতম হলো এবং কর্মরত প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের পরিচালনায় দেশে প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের ঐ সুনামের কারণেই শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। ২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শেখ হাসিনা জনাব এমএ সাঈদ নামক গোপালগঞ্জের এক আমলাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হন। শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, তার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং নিয়োগকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে স্থূল কারচুপির অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশালীন উক্তি করেন।

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রপতি, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ও নির্বাচন কমিশনকে তিনি মেনে নেবেন না। এর জন্য তিনি লগি-বৈঠা নিয়ে অবরোধ করতেই থাকবেন।

১৯৯১, '৯৬ ও '০১ সালের নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়েছে বলে দেশের ও বিদেশের সকল পর্যবেক্ষক এমনকি আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশের সকল রাজনৈতিক দলই স্বীকার করেছে। এ পদ্ধতিকে অকার্যকর করে শেখ হাসিনা নির্বাচনপদ্ধতিকেই বানচাল করতে চাচ্ছেন। বারবার তিনি ঘোষণা করছেন, তার দাবি না মানলে বাংলার মাটিতে তিনি নির্বাচন হতেই দেবেন না।

তার দাপটের ভাষা শুনলে মনে হয়, তিনিই এ দেশের মালিক। তার খুঁটির গোড়া কোথায় জানি না। ২৮ অক্টোবর ('০৬) তিনি যে পশুশক্তির মহড়া দেখালেন, সেটাই যদি তার শক্তির উৎস হয়ে থাকে তাহলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। সেদিন তিনি যে শক্তি জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন, তা বিএনপি'র উপর প্রয়োগ করার হিম্মত করেননি। সেদিন কোনো সরকার ছিল না। সেদিন সরকারি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছিল।

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশনারদের উপর এত ক্ষিপ্ত কেন?

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা এত খেপা কেন? তিনি কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত বলে কোনো অভিযোগও এ পর্যন্ত কেউ করেননি। ২০০১ সালে শেখ হাসিনার আমলে যে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাতে বিরাটসংখ্যক ভুয়া ভোটার ছিল বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

প্রতি ৫ বছর পরপর নির্বাচন হয়। এ সময়ের মধ্যে অনেক লোক নতুন ভোটার হওয়ার বয়সে পৌঁছে। মৃত্যুর কারণে অনেক লোক তালিকা থেকে বাদ পড়ার কথা। পুরাতন তালিকায় ভুয়া ভোটার থাকলে নতুন তালিকায় তারাও বাদ পড়বে। তাই আগের সকল নির্বাচনের সময় যেমন নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে, ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্যও নতুন তালিকা তৈরি করা প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রয়োজন মনে করেছেন– এটাই তাঁর প্রধান অপরাধ। আওয়ামী আইনজীবীরা হাইকোর্টে মামলা করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার পক্ষে রায় পেয়ে যান। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন আপিল বিভাগে মামলা করে। আপিল বিভাগ ঐ রায় বহাল রাখায় নির্বাচন কমিশন নতুন তালিকা বাতিল করে হালনাগাদ তালিকা তৈরি করে। এ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমা করতে রাজি নন। তার আমলে প্রণীত ভোটার তালিকা প্রথমে মেনে নিতে অসম্মত হওয়ার অপরাধ শেখ হাসিনার নিকট অমার্জনীয়। তাই তাঁকে অপসারণ করতেই হবে।

নির্বাচনে কারচুপি কীভাবে হয়?

আমাদের দেশে শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে বিভিন্ন মাত্রায় নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। শেখ মুজিবের আমলে পাইকারি হারে, জিয়ার আমলে নিম্নহারে এবং এরশাদের আমলে উচ্চহারে কারচুপি হয়েছে।

কীভাবে কারচুপি করা হয়? ভোটকেন্দ্রে ভোটদান সম্পন্ন হলে কেন্দ্রে ভোট গণনার সময়ও কারচুপি করে একজনের ভোট আরেকজনের হিসাবে যোগ করতে পারে। সব প্রার্থীর এজেন্ট সেখানে হাজির থাকলে এমনটা করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

সকল ভোটকেন্দ্র থেকে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের তালিকা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে জমা হলে সেখানে যখন সকল তালিকার যোগফল তৈরি করা হয়, সেখানে রিটার্নিং অফিসার ও গণনাকারীদের যোগসাজসে কারচুপি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

রিটার্নিং অফিস থেকে ভোটের যোগফল ঘোষণা করার পরও উপরের চাপে ব্যালট বাক্স রদবদল করে ফলাফল পাল্টে দেওয়ার নজির ১৯৮৮ পর্যন্ত সকল নির্বাচনেই কম-বেশি পাওয়া যায়।

দলীয় সরকারের আমলে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের চাপে রিটার্নিং অফিসাররা চাকরি রক্ষার প্রয়োজনে নির্বাচনী ফলাফল কর্তাদের মর্জি অনুযায়ী বদলে দিতে বাধ্য হন। এ দুর্নীতিমূলক জঘন্য কারচুপি থেকে নির্বাচনকে রক্ষার প্রয়োজনেই নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগত তিনটি নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসাররা তা করেননি। কারণ, কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় থাকায় উপর থেকে কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয়নি।

নির্বাচন কমিশনারগণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের পক্ষ থেকে রিটার্নিং অফিসারদের উপর চাপ প্রয়োগ করে নির্বাচনী ফলাফল বদলে দেওয়ার কোনো নজির নেই। এ জাতীয় কাজ দলীয় সরকারই করতে পারে। এখানে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সরাসরি জড়িত। নির্বাচন কমিশনের এমন কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালক ও নির্বাচন কমিশনের উপর কারচুপির আশঙ্কা করা সম্পূর্ণ অমূলক ও অবাস্তব। বিচারপতি কেএম হাসান ও বিচারপতি এমএ আজিজের পরিচালনায় ঐ জাতীয় কারচুপির সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা একেবারেই অযৌক্তিক।

২০০১ সালে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ সাঈদ এবং পুলিশপ্রধান ও সেনাপ্রধান রিটার্নিং অফিসারদেরকে চাপ দিয়ে শেখ হাসিনাকে হারিয়ে দিয়েছেন বলে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ শেখ হাসিনা দাঁড় করাতে পারেননি। এ সত্ত্বেও তার পরাজয়ের জন্য উপরিউক্ত সম্মানিত পাঁচ জনের বিরুদ্ধেই শেখ হাসিনা অত্যন্ত অশালীন ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

২০০৪ সালের ৪ জানুয়ারি বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের প্রদত্ত বিবৃতি

"গত কয়েক মাস ধরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন রাজনীতিবিদ এবং কয়েকজন কলাম লেখক প্রায়শ আমার সম্পর্কে অসত্য তথ্য এবং বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। এসব বক্তব্যের সারকথা হলো– অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে

www.pathagar.com

দেওয়া হয়েছে। আর এর পেছনে আমারও হাত রয়েছে। আমার আদর্শ ও নীতিবোধ নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এসব বিকৃত ও উস্কানিমূলক বক্তব্যের জবাব দেওয়ার ইচ্ছে আমার হয়নি। সম্প্রতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিছু শালীনতাবর্জিত বক্তব্য এবং একজন কলাম লেখকের বক্তব্যে চরম মিথ্যাচার করা হয়েছে বলে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। শেখ হাসিনার বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. প্রেসিডেন্ট বাঙালি জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করেছেন,

২. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক বাহিনী নামিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করেছেন বলে শেখ হাসিনা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। তিনি বা তার দু-একজন অনুসারী আগেও বলেছেন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমাকে তারা বিশ্বাস করে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিলেন; কিন্তু আমি মোনাফিকী করেছি। আমি এমন কোনো মুচলেকা দিয়ে প্রেসিডেন্ট হইনি যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন হওয়ার কয়েকদিন আগেও শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে আমাকে বলেছেন, আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম বলেই তারা পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে পেরেছেন।

নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। আমি হয়ে গেলাম বিশ্বাসঘাতক। হেরে যাওয়ার পর তারা আমাকে নির্বাচন বাতিল করে প্রেসিডেন্টের অধীনে পুনরায় নির্বাচন করার অনুরোধ করেন। আমি তাতে রাজি হইনি। সবকিছু তাদের মনের মতো হলে আমি দেবতুল্য, না হলে নরাধম। নির্বাচনের কিছুদিন আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সারা দেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এর পেছনেও তারা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করেছেন। অথচ এই সামরিক বাহিনীর প্রধানকে শেখ হাসিনাই মনোনীত করেছেন।

সেনাপ্রধান তার সঙ্গে একই জনসভায় বলেছেন যে, তিনি রাজাকারদের নির্মূল করবেন। তাহলে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, সেই সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পরে বিজয়ী দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে দিয়েছে? নির্বাচনে সেনাবাহিনী প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেছে। তাদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নির্বাচনের ১০/১২ দিন আগে প্রধান উপদেষ্টা সেনাবাহিনী নিয়োগের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন এবং তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করা এবং জয়-পরাজয়ের কারণ নির্ণয়

www.pathagar.com

করা কঠিন নয়। এত বেশি দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক এবং জনগণ যারা ভোট দিয়েছেন তারা কারচুপির অভিযোগ করছেন না। শুধু একদেশদর্শী রাজনীতিবিদ এবং কলাম লেখক যেভাবে অগভীর ও অর্থহীন ব্যাখ্যা করে চলেছেন, তা স্বেচ্ছাচারের পর্যায়ে পৌঁছেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখার স্বার্থে এ ধরনের প্রচারণা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।"

বিজয়ের নিশ্চয়তা কে দেবে শেখ হাসিনাকে?

শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হলো, বিজয়ের নিশ্চয়তা না জেনে তিনি নির্বাচনে যেতে চান না। এ নিশ্চয়তা কে দিতে পারে?

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ও এর উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারগণ এমন লোক হতে হবে, যাদের উপর শেখ হাসিনার পূর্ণ আস্থা হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে সরকারের সচিবালয়ে জোট সরকারের আমলে যাদেরকে বসানো হয়েছিল তাদের সবাইকে বদলি করতে হবে এবং সেসব পদে যাদেরকে বসানো হবে তাদের নিরপেক্ষতার সার্টিফিকেট শেখ হাসিনা থেকে নিতে হবে।

বিশেষ করে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে শেখ হাসিনার ১১ দফা দাবি মেনে প্রমাণ দিতে হবে যে, তিনি নিরপেক্ষ।

এসব দাবি পূরণ না হলে তিনি অক্টোবরের ২৭-২৮-২৯ তারিখের মতো লগি-বৈঠা নিয়ে অবরোধ করে তার সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য করবেন।

সারকথা হলো, নির্বাচনে তার বিজয়ের নিশ্চয়তাবোধ না করলে তিনি নির্বাচন হতেই দেবেন না; কিন্তু এ নিশ্চয়তা কে দিতে পারে?

শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের জুন থেকে পাঁচ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে দুঃশাসন চালিয়েছেন, তাতে কয়েকটি পরিকল্পনা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা;

২. মুজিব হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা;

৩. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমের উদ্দেশ্যে মাদরাসা শিক্ষাকে হয় সংশোধন, না হয় পঙ্গু করে রাখা;

www.pathagar.com

৪. সরকারি গণভবনকে ব্যক্তিগত মালিকানায় পুনর্বহাল করা (২০০১ সালে কেয়ারটেকার সরকার ঐ ভবনের দখলস্বত্বের ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল করেছিল);

৫. ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে যাতায়াতের জন্য ভারত সরকারকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করা;

৬. সংবিধান সংশোধন করে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করা;

৭. ভারতের দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্যাস বিক্রয় করা;

৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করার কৃতজ্ঞতা হিসেবে বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য স্থাপন করা।

এসবের কোনোটাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ও জনগণের স্বার্থের পক্ষে নয় বলে নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে সমর্থন করা স্বাভাবিক নয়। তাই ক্ষমতা হাসিল করতে হলে বিদেশের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই বলেই তিনি ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আজব রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন। আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের দুয়ারে ধরনা দিয়ে হতাশ হয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দিয়ে চলেছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের কূটনীতিকগণ অতি উৎসাহের সাথে মুরব্বিয়ানার ভঙ্গিতে রাজনৈতিক উপদেশ খয়রাত করছেন। কূটনীতিকগণ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে, শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য অনেক অযৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করার সাহস পেয়েছেন।

সঙ্গত কারণেই কূটনীতিকগণ মনে করেন যে, প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে গণতন্ত্র সংহত হতে পারে না। শেখ হাসিনা টের পেয়ে গেছেন যে, তার দল নির্বাচন বর্জন করলে গণতান্ত্রিক বিশ্বে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। তাই তার অযৌক্তিক সব দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি জিদ ধরেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি গত ২৮ অক্টোবর '০৬ তারিখে শক্তি প্রয়োগ করে বিচারপতি কেএম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন। এর জন্য রাজধানী ঢাকায় তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালান এবং সারা দেশেই তার লগি-বৈঠা-লাঠিধারীরা ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

অক্টোবরের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে শেখ হাসিনার অবরোধের সময় টেলিভিশনে কূটনীতিকগণ শেখ হাসিনার গণতন্ত্রের নমুনা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তারা

www.pathagar.com

বুঝতে পেরেছেন যে, শেখ হাসিনা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। তাই তারা শেখ হাসিনার আজব রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ

কোনো স্বাধীন দেশের রাজনীতি সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। এতে বিদেশের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ থাকার কথা নয়।

১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে তিনটি নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়ে গেল। রাজনৈতিক দলসমূহ স্বাধীনভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোনো এক দলের ৫ বছরের বেশি এক দিনও ক্ষমতায় টিকে থাকার ইখতিয়ার নেই এবং নির্বাচনে কোনো দলেরই কারচুপি করার পথ নেই। এ অবস্থায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র সংহত হওয়ারই কথা।

কিন্তু শেখ হাসিনা ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ফলাফল মেনে না নিয়ে বিদেশের নিকট ধরনা দিলেন। তার এ আজব ভূমিকার কারণেই বিদেশিরা এ দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছেন। চার দলীয় জোট সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এম মোরশেদ খান বারবার প্রতিবাদ না করলে তারা মাথায় চড়ার চেষ্টা করতেন। তাদের নাক গলানোর জন্য শেখ হাসিনাই একশ' ভাগ দায়ী।

কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টাদের ভূমিকা

২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর সংবিধান অনুযায়ী ১০ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন।

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় হওয়ার কথা; কিন্তু প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক দলের নিকট উপদেষ্টাদের নাম চাইলেন। রাজনৈতিক দল যাদের নাম দিলেন তাদের মধ্যে দলীয় মনোভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। সকল দলের তালিকা থেকে যদি কমন কোনো নাম পাওয়া যায়, তাহলে তিনি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় হিসেবে গণ্য হতে পারেন। যারা কমন নন তারা তো দলীয় হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে দীর্ঘ সংলাপ সত্ত্বেও কোনো সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হলো না। যেখানে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে পরামর্শ করেও কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য সর্বসম্মতভাবে কারো

www.pathagar.com

নাম জোগাড় করতে পারলেন না, সে পরিস্থিতিতে উপদেষ্টাগণ রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সংলাপ করে মীমাংসায় পৌঁছানোর দুঃসাহস করতে গিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করলেন; দফায় দফায় অবরোধের নামে গোটা দেশকে অচল করে রেখে যারা কেয়ারটেকার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তাদেরকে তোয়াজ করে আরো আস্কারা দিলেন।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা বহাল ও দেশকে সচল রাখার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের। যারা অবরোধ করে সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করলেন তাদেরকে খোশামোদ করে উপদেষ্টাগণ কী পেলেন? তাদের উচিত ছিল সংলাপের পূর্বে অবরোধ মুলতবি করতে রাজি করানো।

আওয়ামী লীগের মেজাজ অনুযায়ী তারা সরকারকে আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার দাবিই জানালেন। যা হোক, উপদেষ্টাগণ আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনার পর আশা করি আওয়ামী লীগ কী চিজ তাঁরা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

হয়তো তারা আন্তরিকতার সাথে চেয়েছেন যে, আওয়ামী লীগ যেন নির্বাচনে আসে। তারা যে ১১ দফা দাবি মেনে নেওয়ার শর্ত দিয়েছেন তাতে কি প্রমাণ হয় যে, তারা নির্বাচন চান? তাহলে তারা আইডি কার্ডসহ নতুন ভোটার তালিকার দাবি কেমন করে করলেন? এর জন্য কমপক্ষে এক বছর সময় প্রয়োজন। অথচ ২০০৭ সালের জানুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন হতে হবে।

বিচারপতি কেএম হাসানকে বিব্রত করে শেখ হাসিনা কি বিজয়ী হলেন?

শেখ হাসিনা কথায় কথায় বিজয় নিয়ে গর্ব করেন। চৌদ্দ দলীয় জোট ও চার দলীয় জোটের মধ্যে সংলাপে জামায়াতের উপস্থিতির কারণে সংলাপে বসলেন না। দুদলের মহাসচিবের মধ্যে বৈঠক হওয়ায় জামায়াতকে ছাড়া সংলাপ হওয়াকে তিনি বিজয় বলে তৃপ্তিবোধ করলেন।

বিচারপতি কেএম হাসানকে লগি-বৈঠা-লাঠি নিয়ে সন্ত্রাস করে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করলেন। এটাকে শেখ হাসিনা বিরাট বিজয় মনে করলেন। বিচারপতির বদলে বিএনপি'র নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টা হলেন। বিচারপতি কেএম হাসান এ দায়িত্ব নিলে কি এর চেয়ে বেশি ভালো হতো না?

জুন ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপি নেতা জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিএনপি সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা বিজয়ী হলেন। জনগণ ভোট দিলে প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার

www.pathagar.com

সরকারপ্রধান ও নির্বাচন কমিশন বিজয় ঠেকাতে পারেন না। এ কথা শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই বোঝেন। আসলে নির্বাচনপ্রক্রিয়া বানচাল করে দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। উপদেষ্টাগণ সে কথা উপলব্ধি করলে তারা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবেন। অহেতুক আওয়ামী লীগকে তোয়াজ করে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না।

২০০১ সালের নির্বাচনের সময় শেখ হাসিনার মনোনীত প্রেসিডেন্ট ও তার নিয়োগকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারগণ ছিলেন। জনগণ চার দলীয় জোটকে সংসদের দু-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে বিজয়ী করে। শেখ হাসিনার প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব করে শেখ হাসিনাকে জিতিয়ে দেননি।

ইতঃপূর্বে ভোট কারচুপি কীভাবে হয়ে থাকে, এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হলে ঐভাবে কারচুপি হতে পারে না– বিগত তিনটি নির্বাচনে নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

শেখ হাসিনার ক্ষমতালিপ্সাই রাজনৈতিক সংকটের আসল কারণ

শেখ হাসিনা একবার ক্ষমতায় গিয়ে যে মজা পেয়েছেন এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় যাওয়ার যে নীল নকশা এঁকেছিলেন, তাতে ব্যর্থ হয়ে মেজাজের ভারসাম্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন বলেই মনে হয়। সংবিধানের মর্যাদা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনগণের সুখ-শান্তি তার ক্ষমতালিপ্সার নিকট একেবারেই মূল্যহীন। প্রথম বার তিন দিন ও দ্বিতীয় বার চার দিন লাগাতার অবরোধ করে দেশকে অচল করার যে যোগ্যতার প্রমাণ তিনি দিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে, দেশ ও জনগণের মঙ্গল করার কোনো যোগ্যতা না থাকলেও ক্ষতি করার প্রচুর সামর্থ্য তিনি রাখেন।

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক পন্থায় চেষ্টা করার পরিবর্তে ফ্যাসিবাদী উপায়ের আশ্রয় নিয়ে তিনি জনগণের প্রতি আস্থাহীনতারই প্রমাণ দিলেন। ২০০১ সালে জনগণ কেন তাকে ক্ষমতায় বসতে দিল না, এরই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ১৪ কোটি মানুষকে তিনি অবরোধের মাধ্যমে জিম্মি করে রাখলেন। এতে জনগণ যে তার প্রতি ক্ষিপ্ত হচ্ছেন তা তিনি টের পাচ্ছেন না।

শেখ হাসিনা আস্ফালন করে বলেন যে, তার সংস্কার দাবি জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে। যদি এ কথা সত্য হতো তাহলে কবেই তার পক্ষে গণ-অভ্যুত্থান হয়ে যেত। চার দলীয় জোট সরকারের সময় বারবার গণ-অভ্যুত্থানের অপচেষ্টা

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু বর্তমান দুর্বল কেয়ারটেকার সরকারের আমলেও তো জনগণ তার পক্ষে সাড়া দিল না। তার লাঠি-লগি-বৈঠার দাপটে সরকারের উপদেষ্টাগণ তার দরবারে বারবার ধরনা দিয়ে যে চরম দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও জনগণ এগিয়ে এল না; বরং জনগণ তার বাড়াবাড়ি বরদাশত করছে এবং দুর্বল কেয়ারটেকার সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হচ্ছে।

শেখ হাসিনা যদি নির্বাচন বানচাল করতে ব্যর্থ হন এবং কেয়ারটেকার সরকার যদি নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয় তাহলে আশা করা যায় যে, জনগণ ব্যালটের অস্ত্র প্রয়োগ করে তার ক্ষমতার লিপ্সা মিটিয়ে দেবে।

গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আসল কারণ

'গণ' মানে পাবলিক বা জনগণ। 'গণতন্ত্র' অর্থ জনগণের শাসন। জনগণ সরাসরি শাসন করতে পারে না। তাই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষ থেকে শাসন করেন। গণতান্ত্রিক দেশে কয়েক বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর যে সরকার কায়েম হয় এর মেয়াদ শেষ হলে আবার নির্বাচন হয়। জনগণ যাদেরকে নির্বাচিত করে তারা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধান বা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে পরিচালিত হবে এবং কোন্ বিভাগের ক্ষমতার সীমা কতটুকু এসব যেমন সুস্পষ্ট ভাষায় সংবিধানে উল্লেখ থাকে, তেমনি নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কেও সংবিধানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ধার্য করা থাকে।

সাধারণত, সংবিধান প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমেই শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রের সকলকেই তা মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয়। সরকার ও জনগণ সংবিধানকে পবিত্র দলিল হিসেবে স্বীকার করে এবং এর মর্যাদা রক্ষা করা নাগরিক কর্তব্য বলে গণ্য করে।

প্রকৃতপক্ষে এ সংবিধানই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য নির্বাচন অপরিহার্য। আর রাজনৈতিক দল ছাড়া নির্বাচন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলসমূহ যদি বিশ্বস্ততার সাথে সংবিধান মেনে চলে তাহলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। রাজনৈতিক দলই নির্বাচিত হয়ে দেশ শাসন করে এবং শাসনতন্ত্র সংরক্ষণ করে। রাজনৈতিক দল ছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন করার সাহস

www.pathagar.com

অন্য কারো নেই। রাজনৈতিক দলই যদি সংবিধান অমান্য করে তাহলে গণতন্ত্র অবশ্যই বিপন্ন হয়। এটাই গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আসল কারণ। সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা দখলের কারণে অবশ্যই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়; কিন্তু রাজনৈতিক সরকারের অযোগ্যতার ফলেই সশস্ত্র বিপ্লব সফল হয়ে থাকে। তাই গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বই আসল দায়ী।

সংবিধান সংশোধন ও লঙ্ঘন এক কথা নয়

সংবিধান প্রণয়ণের সময়ই তাতে উল্লেখ করা হয় যে, এর সংশোধন করার প্রয়োজন হলে কোন্ পদ্ধতিতে তা করা যাবে। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংসদের দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ছাড়া কোনো সংশোধনই বৈধ বলে গণ্য হবে না। কোনো সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জরুরি নয়। তাই সংসদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কোনো সংশোধনের বিরোধী হলেও তা বৈধ হবে।

এ পর্যন্ত সংবিধানের যতগুলো সংশোধনী সংসদে পাস হয়েছে, এর মাত্র অল্প কয়েকটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে; কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী পাস হওয়ার কারণে সবকয়টিই বৈধ। কোনো সংশোধনীই অসাংবিধানিক নিয়মে হয়নি।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারপদ্ধতি পরিবর্তনসহ এমন কতক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা গণতন্ত্র হত্যার শামিল। ঐ সংশোধনীকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিলেও অসাংবিধানিক বলা চলে না। কারণ, তা সংসদে প্রায় সর্বসম্মত অনুমোদন পেয়েছে। মাত্র দুজন সদস্য এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা হলেন জেনারেল এজি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন।

সংশোধনী দ্বারা সংবিধানে যত বড় পরিবর্তনই আসুক এবং তা নিয়ে রাজনীতিকদের মধ্যে যত বড় মতপার্থক্যই থাকুক, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সংশোধন করা হলে তাকে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে দাবি করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, সংবিধান সংশোধন ও লঙ্ঘন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটিই এখন বিপন্ন

অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যেই সকল রাজনৈতিক দল ১৯৯০ সালে একমত হয়ে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পদ্ধতিটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগেই ১৯৯১ সালে এ পদ্ধতিতে এ দেশে প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশে-বিদেশে তা প্রশংসিতও হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয়ী হওয়ায় এ পদ্ধতির

www.pathagar.com

কোনো সংস্কার তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় তিনি নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতেই অস্বীকার করেন। অথচ সে নির্বাচন তারই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও তারই নিয়োগকৃত নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের বিরুদ্ধেও নির্বাচনের পূর্বে তিনি রাজনৈতিক দলীয় ব্যক্তি বা অনিরপেক্ষ হিসেবে কোনো অভিযোগ করেননি।

২০০৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে শেখ হাসিনা প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আন্দোলন করে সংবিধান লঙ্ঘনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, এর পরিণামে ভবিষ্যতে যদি বিচারপতিগণ এসব পদ গ্রহণ করতে বিব্রতবোধ করেন তাহলে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটিই বিপন্ন হয়ে পড়বে। শেখ হাসিনার সংবিধানবিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত সম্মানিত বিচারপতিগণকে যে চরমভাবে অপমানিত করল এবং তার দলের নেতারা তাদের বিরুদ্ধে যে ইতর ভাষা প্রয়োগ করেছেন, এরপর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কোনো বিচারপতি এসব পদ গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে।

দেশের রাজনীতি যে দুপ্রান্তিক মেরুতে বিভক্ত, তাতে কোনো ব্যক্তির পক্ষে উভয় মেরুতে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দের ঐকমত্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ পরিস্থিতিতে কেয়ারটেকার সরকার গঠনে চরম সংকট দেখা দিতে পারে।

শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

শেখ হাসিনা দেড় বছরব্যাপী সংস্কার আন্দোলন করলেন। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার আন্দোলন করতে গিয়ে বহু বার তিনি হরতাল, রোডমার্চ, লংমার্চ, মহাসমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল করেন; গণ-অভ্যুত্থানের হুমকিও কয়েক বার দিলেন। আওয়ামী লীগ চার বছর পর্যন্ত জোট সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার ঘোষণা দিতেই থাকলেন; কিন্তু কিছুই করতে পারেননি।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর চার দলীয় জোট সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে। এর পূর্বে মাসখানেক দুপক্ষের দুমহাসচিব নিষ্ফল সংলাপ চালান। নবগঠিত কেয়ারটেকার সরকার গঠনের সময় শেখ হাসিনা ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর একটানা তিন দিন অবরোধ আন্দোলনে গোটা দেশকে অচল করে রাখেন। লাঠি-বৈঠা-লগি এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে দেশের ১৪ কোটি মানুষকে জিম্মি করে ফেলেন। দেশে তখন সরকার ছিল না বললেই চলে।

www.pathagar.com

২৯ অক্টোবর কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং পরের দিন ১০ জন উপদেষ্টা শপথ নিলে নতুন সরকার কায়েম হয়। এ সরকারকে নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য ৪ দিন সময় দিয়ে নভেম্বরের ৪ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত তারা আবার অবরোধের নামে নৈরাজ্য কায়েম করলেন। কয়েকজন উপদেষ্টার অনুরোধে নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য আরো সময় দিয়ে ২০ থেকে ২৩ নভেম্বর অবরোধ অব্যাহত রাখলেন।

সংস্কার আন্দোলনের বিরাট সাফল্যের জন্য বিজয় উৎসব করা হলো; কিন্তু কী বিজয় হলো তা বোধগম্য নয়। অবরোধ করে ২৮ অক্টোবর বিচারপতি কেএম হাসানকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হওয়া থেকে বিরত রেখে নাকি তারা প্রথম বিজয় অর্জন করলেন; আর ২৩ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ছুটি নিতে বাধ্য করে নাকি দ্বিতীয় বিজয় অর্জন করলেন।

বিচারপতি কেএম হাসান ২৫ বছর পূর্বে দলীয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৪ দল তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধা দিয়ে দলীয় নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ঐ দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দিল। বিচারপতি এমএ আজিজকে সরিয়ে বিচারপতি মাহফুজুর রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যবস্থা করে শেখ হাসিনা কী অর্জন করলেন?

শেখ হাসিনার বিজয় লাভের হিসাবটা কি শূন্যের কোঠায় বলে মনে হয় না? তার সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল শুধু শূন্য নয়, মাইনাসই বলা চলে। যে দুজনের বিরুদ্ধে এমন মহাআন্দোলন করা হলো তাঁদের কি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করার কোনো সামান্য আশঙ্কাও ছিল? তাঁদের বদলে যাদের উপর দায়িত্ব এল তাঁরা ঐ দুজনের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করার যুক্তি কী?

আসলে শেখ হাসিনার রাজনীতি হলো জিদ ও হিংসার রাজনীতি। যাঁদেরকে অপসারণের জন্য তিনি জিদ ধরলেন তাঁদেরকে সরাতে সক্ষম হওয়া বিজয়ই বটে। তিনি এ বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করুন। তাতে তার প্রতিপক্ষের কিছুই আসে-যায় না।

এটা যদি তার বিজয় হয়ে থাকে তাহলে তা প্রতিপক্ষের পরাজয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। ঐ দুব্যক্তির বদলে যে দুজনের উপর দায়িত্ব অর্পিত হলো তাতে কি প্রতিপক্ষের পরাজয় হয়েছে বলে শেখ হাসিনা সত্যি বিশ্বাস করতে পারবেন?

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মালিক কে? জনগণ, নাকি শেখ হাসিনা?

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের নভেম্বরে শেখ মুজিবের শাসনামলেই প্রণীত হয়। সংবিধানের ৭(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।'

এই ধারা অনুযায়ী জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৯১ সালে বিএনপিকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে এবং ২০০১ সালে চার দলীয় জোটকে ক্ষমতা প্রয়োগ করার দায়িত্ব অর্পণ করে।

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত কোনো সরকার পাঁচ বছর মেয়াদের অতিরিক্ত এক দিনও ক্ষমতায় থাকতে পারে না। মেয়াদ শেষ হলেই সেই ক্ষমতা আবার জনগণের হাতে ফিরে আসে। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে আবার যাদের হাতে ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব দেয়, তারাই পাঁচ বছর জনগণের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করবে।

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ জাতীয় সংসদের দু-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে চার দলীয় জোটকে বিজয়ী করে ক্ষমতাসীন করেছে। দেশ-বিদেশে সকল নির্বাচন-পর্যবেক্ষক ঐ নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অবাধ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

কিন্তু শেখ হাসিনা কোনো সামান্য প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়াই দাবি করলেন যে, জনগণ চার দলীয় জোটকে ক্ষমতা দেয়নি। জনগণ নাকি তাঁকেই ক্ষমতা দিয়েছিল; কিন্তু দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, নির্বাচন কমিশনপ্রধান, পুলিশ প্রশাসনপ্রধান ও সেনাপ্রধান জনগণের ঐ ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে চার দলীয় জোটকে দিয়ে দিয়েছে। তারা সবাই শেখ হাসিনার ভোট চুরি করেছেন।

শেখ হাসিনা যে হামেশা চার দলীয় জোটকে 'ভোট চোর' বলে গালি দেন, এ গালিটি আসলে উক্ত ৫ প্রধানকেই দেওয়া হচ্ছে। কারণ, নির্বাচন পরিচালনা তারাই করেছেন, চার দলীয় জোট করেনি।

প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনা জনগণকে ক্ষমতার মালিক মনে করেন না। করলে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যে রায় দিয়েছে তা মেনে নিতেন। ১৯৯৬ সালে তাকে ক্ষমতা দেওয়ার কারণেই তিনি সে রায় মেনে নিয়েছেন। এর মানে হলো, জনগণ তাকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রায় দিলে তিনি তা মেনে নেন না।

এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, শেখ হাসিনা নিজেকেই এ দেশের ক্ষমতার মালিক মনে করেন।

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার সরকার আমলে শেখ হাসিনার মালিকসুলভ হুমকি

কেয়ারটেকার সরকার জনগণের নির্বাচিত সরকার নয়। দেশ শাসন করাও এ সরকারের দায়িত্ব নয়। সংবিধান এ সরকারকে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়েছে এবং সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই এ সরকার জনগণের নির্বাচিত সরকারের মতো শক্তিশালী ও সাহসী হতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলো এ সরকারকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থন দিলে এবং সর্বদিক দিয়ে এ সরকারের সাথে সহযোগিতা করলেই তারা শক্তি ও সাহস পেতে পারে।

শেখ হাসিনা ২০০৫ সালের জুলাই থেকেই তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের নামে দেশের মালিকসুলভ হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। চার দলীয় জোট সরকারের আমলে তিনি কোনো পাত্তা পাননি। হরতাল ও মহাসমাবেশসহ নাশকতামূলক কর্মসূচি দিয়ে সরকারকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছেন; কিন্তু দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও জনগণকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারেননি। গণ-আন্দোলন করে সরকারকে তার সংস্কার দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার হুমকি তিনি বহু বার দিয়েছেন। গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে 'খালেদা-নিজামী' সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করবেন বলে বারবার দাবি করেছেন। সংসদ বর্জন করে রাজপথে লম্ফ-ঝম্ফ করে চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে এ কথা বলে সংসদে যোগদান করলেন যে, তার সংস্কার আন্দোলন সংসদ ও রাজপথ উভয় ময়দানে সমানভাবে চলবে।

জোট সরকার তাদেরকে সংসদে স্বাগত জানিয়ে তাদের সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে কমিটি পর্যায়ে আলোচনার সুযোগ দান করে; কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর কেউ কমিটিতে থাকলে তারা আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। জোট সরকার শেষ পর্যন্ত প্রধান দুদলের মহাসচিবের মধ্যে সংলাপের সুযোগ দেয়; কিন্তু তারা সাবেক প্রধান বিচারপতি কেএম হাসানকে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা না হওয়ার দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হন।

জোট সরকারের আমলে শেখ হাসিনা অবরোধ করে দেশকে অচল করে দেওয়ার হিম্মত দেখাননি। লগি-বৈঠা নিয়ে সন্ত্রাস করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনেরও সাহস পাননি।

দুর্বল কেয়ারটেকার সরকারের আমলে শেখ হাসিনা তার ফ্যাসিবাদী অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে সরকারকে কাবু করে বিচারপতি কেএম হাসানকে কেয়ারটেকার

www.pathagar.com

সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেন; আরো একটা অবরোধ দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজকে ছুটিতে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করেন। এভাবে এ সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সংবিধানবিরোধী বড় বড় দুটো দাবি জোর করে আদায় করে নেওয়া হয়।

পূর্ববর্তী কোনো কেয়ারটেকার সরকারকে এ জাতীয় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। শেখ হাসিনার দুটো দাবি পূরণ করতেই সরকারের ৯০ দিন মেয়াদের ২৬ দিন বাজে খরচ হয়ে গেল।

দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শেখ হাসিনার অবদান

১৯৯৬ সালের জুন থেকে ৫ বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও জনগণের প্রতি নিম্নরূপ অবদান রেখেছেন :

১. তার চরম ইসলামবিরোধী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে এ দেশে চালু করার উদ্দেশ্যে ইসলামকে দুর্বল করার ব্যাপক ষড়যন্ত্র করেন।

   ক. সংবিধান থেকে ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ কুফরী মতবাদের পক্ষে দাপট দেখাতে থাকেন।

   খ. ইসলামী দলগুলোকে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা চালান।

   গ. মাদরাসা শিক্ষাকে সংকুচিত করে ক্রমান্বয়ে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

   ঘ. মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে অনেক বড় বড় আলেমকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখেন।

   ঙ. দীনের বিধান জানার জন্য আল্লাহ তাআলা জনগণকে আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলেমগণ যে রায় দেন, এরই নাম ফতোয়া। আল্লাহ স্বয়ং আলেমগণকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। কোনো এক স্থানে এ ফতোয়ার অপপ্রয়োগকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে জানুয়ারি ২০০১ সালে ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি গোলাম রাব্বানি কোনো মামলা ছাড়াই নিজের পদের দাপট দেখিয়ে আলেমসমাজের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেওয়া বেআইনি ঘোষণা করেন। বিচারপতির এ

www.pathagar.com

রায় শেখ হাসিনার এত পছন্দ হয় যে, এ ধৃষ্টতার পুরস্কারস্বরূপ অন্য সিনিয়র বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে এ বিচারপতিকে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে প্রমোশন দেন।

২. তিনি তার পিতার বাকশালী আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার পিতা ১৯৭৫ সালে সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করে বাকশাল নামে একটি দল গঠন করেন। বাংলাদেশকে ৬১টি প্রদেশে বিভক্ত করে ৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করেন। 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' স্লোগান চালু করে শেখ মুজিব এ দেশের ডিকটেটর (স্বৈরশাসক) হন।

এ ব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়নের পূর্বেই একদল মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার শেখ মুজিবকে হত্যা করে গণতন্ত্রকে পুনর্বহালের সূচনা করেন এবং বাংলাদেশকে মুজিব-পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে তার পিতার আদর্শকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে নতুন কৌশল অবলম্বন করেন।

ক. তিনি গভর্নরের বদলে গডফাদার নিয়োগ করে বিভিন্ন জেলায় তার দলীয় সন্ত্রাসীদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে থাকেন। ২০০১ সালে আবার ক্ষমতায় যেতে না পারায় সকল জেলায় এ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি।

খ. জাতীয় সংসদকে বাকশালী কায়দায় ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, যাতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং বিনা বাধায় স্বেচ্ছাচারমূলক আইন পাস করা যায়।

গ. সরকারবিরোধীদেরকে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন করেন। শেখ হাসিনা এ আইনকে যথেষ্ট মনে করেননি। সন্ত্রাস দমনের দোহাই দিয়ে তিনি 'জননিরাপত্তা আইন' নামে এক জঘন্য কালা কানুন পাস করে তা বিরোধী দল, এমনকি ছাত্রদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করেন।

ঘ. বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। শাসন বিভাগের যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার আইনগত আশ্রয়ই হলো আদালত। শেখ মুজিব হত্যা মামলায় কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করায় শেখ হাসিনার

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে জঙ্গি লাঠি মিছিল হয়। বিচারপতিদেরকে হুমকি দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সঠিক বিচার না করলে কোথায় লাঠি মারতে হয় তা আওয়ামী লীগ জানে।'

৬. সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি বাকশালী আচরণ। বাকশাল মানে একদলীয় শাসন। যদিও সংবিধান থেকে বাকশাল উৎখাত হয়ে গেছে, শেখ হাসিনার মগজে ও মেজাজে তা পূর্ণরূপে বহাল আছে। যেমন সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ না থাকলেও তার কলবে তা কায়েম আছে। বাকশালী মেজাজের দুটো প্রমাণ দিচ্ছি :

i. বিরোধী দল হরতাল ডাকলে সরকার পুলিশ দিয়ে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে— এটাই সব সময় দেখা যায়; কিন্তু শেখ হাসিনার শাসনামলে বাকশালী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বাকশাল মানে সরকারি দল ছাড়া অন্য কোনো দল না থাকা। তাই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো দলকে ময়দানে তৎপর থাকতে দেওয়া চলে না। তাই আওয়ামী লীগ আমলে প্রত্যেক হরতালের সময়ই দেখা গেছে যে, আওয়ামী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাজপথে নেমে হরতাল প্রতিহত করছে এবং পুলিশ তাদেরকে এ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

ii. যেসব এলাকায় কোনো বিরোধী দলের জনসভা স্থানীয় আওয়ামী নেতারা পছন্দ করেননি সেখানে বিরোধী দলের জনসভাস্থলে আওয়ামীদের পক্ষ থেকে একই দিন ও একই সময়ে জনসভা আহ্বান করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন সংঘাত এড়ানোর দোহাই দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধী দলের জনসভা বন্ধ করার পবিত্র দায়িত্ব পালন করে। এ পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামীর বেলায়ই সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয়।

৩. বাংলাদেশকে তার পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা এবং তার পিতাকে জোর করে জাতির পিতা হিসেবে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

ক. সারা দুনিয়া সাক্ষী যে, মুজিব হত্যার কারণে জনগণ 'ইন্না লিল্লাহ' পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। সারা দেশে মানুষ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে এবং রাজধানী ঢাকায় উৎসবের আমেজে দলে দলে জুমুআর নামাযে যোগদান করেছে। জনগণ যদি তাকে জাতির পিতা হিসেবে গণ্য করত তাহলে এমন আচরণ করা স্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

ইতিহাস ও ঐ সময়কার সংবাদপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, জনগণ শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে মোটেই গণ্য করে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতা হাতে পেয়েই তার পিতাকে জনগণের পিতা হিসেবে মান্য করানোর জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

i. টাকার নোটে শেখ মুজিবের ফটো ছাপানো।

ii. সরকারি সকল স্থানে তার পিতার ফটো ঝুলানো। এমনকি মাদরাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার পিতার ফটো ঝুলানোর জন্য আইন পাস করা।

iii. যমুনা সেতু, পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (পিজি হাসপাতাল) ইত্যাদি স্থাপনার নামের সাথে তার পিতার উপাধি যুক্ত করা। এসব স্থাপনা কি তার পিতা নির্মাণ করে গেছেন?

খ. সরকারি গণভবন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা গণভবনকে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত বাসভবন হিসেবে ঘোষণা করে এবং নির্লজ্জের মতো তিনি তা গ্রহণ করে জানিয়ে দেন যে, যতদিন তিনি রাজনীতি করবেন ততদিন তিনি গণভবনেই থাকবেন।

শেখ হাসিনা যে যে যোগ্যতার অধিকারিণী

শেখ হাসিনা ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকে বিগত ৫ বছর যেসব যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি করার কোনো যোগ্যতা না থাকলেও নিজের জন্মভূমির জঘন্য দুর্নাম রটনা করায় তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত সফর করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়েছেন। বাংলাদেশে নাকি হিন্দুদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। জোট সরকার নাকি সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও তালেবানী। এ অপপ্রচারের মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমেরিকা যেন আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশকেও দখল করে নিয়ে হামিদ কারজাইয়ের মতো তাকে ক্ষমতায় বসায়; আর ভারত যেন হিন্দুদেরকে রক্ষা করার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে আক্রমণ চালায়।

২. শেখ মুজিবের আমলে দুর্নীতির ফলে এ দেশ 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে দুনিয়ায় পরিচিত ছিল। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৯৮ সালে বিশ্বে

www.pathagar.com

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ প্রথম স্থান লাভের গৌরব অর্জন করে। এ দিক দিয়েও তিনি চরম যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন।

৩. দেশের অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনের ব্যাপারে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারলেও তিনি হরতাল, অবরোধ ও বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী আন্দোলন করে শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত করা, পরিবহন বন্ধ করে পণ্য সরবরাহ স্তব্ধ করা, বন্দর অচল করে আমদানি-রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রচুর যোগ্যতা রাখেন।

৪. বিক্ষোভ মিছিল ও হরতাল করার গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিদার শেখ হাসিনা অন্যদের হরতাল না করার গণতান্ত্রিক অধিকারের ধার ধারেন না। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাস্তায় যত গাড়ি বের হয় তা পুড়িয়ে বা ভেঙে দেওয়াও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাদের নির্দেশ অমান্য করে কোনো দোকান খোলা হলে তা লুট করাও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এসব তথাকথিত অধিকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় অর্জন করার যোগ্যতা শেখ হাসিনার অবশ্যই আছে।

৫. জনগণের কল্যাণ করার সামান্য যোগ্যতা না থাকলেও হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে তাদেরকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে বাধ্য করার যোগ্যতা তার যথেষ্ট রয়েছে।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চার কিস্তিতে ১৩ দিন একটানা অবরোধ পালন করে গোটা দেশকে অচল করে রাখার যে যোগ্যতার প্রমাণ তিনি দিলেন এর পরিণামে ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, পণ্য চলাচল ও যাতায়াতে জনগণ, সরকার ও দেশের যে কত বড় ক্ষতি করা হয়েছে তা কোটি কোটি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সকল স্কুল-মাদরাসায় পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করে বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি'র টেস্ট পরীক্ষা হয়ে থাকে। এ সময় অবরোধ করে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে ভোগান্তির শিকার হতে বাধ্য করা হয়েছে।

৬. জনগণের খিদমত করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার যোগ্যতা না থাকলেও নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ভোট না দেওয়ার অপরাধে তাদেরকে সর্বপ্রকার যাতনা দেওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৭. নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করার অদ্ভুত যোগ্যতা তার রয়েছে। দেশ-বিদেশের সকল পর্যবেক্ষক যে নির্বাচনকে সন্তোষজনক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সে নির্বাচনেও স্থূল কারচুপি আবিষ্কার করার যোগ্যতা শেখ হাসিনার অবশ্যই আছে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তাবোধ না করা পর্যন্ত তিনি নির্বাচন হতে দিতে চান না।

চারদলীয় জোটকেই ক্ষমতায় বসাতে হবে

আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ পাঁচ বছরের জন্য নতুন সরকার কায়েম করবে। তাদের হাতেই ক্ষমতা। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ ক্ষমতায় বসতে পারে না।

আওয়ামী লীগ যে হিংসার রাজনীতি চালু করেছে, তাতে গোটা দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছে। জনগণ শান্তিতে থাকতে চায়। তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যারা মানুষকে এত যাতনা দিতে পারে তাদের হাতে ক্ষমতা দিলে দেশের সর্বনাশ হবে।

আশা করি, জনগণ দেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, আমদানি-রফতানি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং সুস্থ, ভদ্র ও শালীন রাজনীতি বহাল করার উদ্দেশ্যে চারদলীয় জোটের হাতেই ক্ষমতা তুলে দেবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com